রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

রাষ্ট্র চেতনা

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

রাষ্ট্র চেতনা

ACADEMIC JOURNAL

বিভাগীয় প্রধানার কলমে .....

ডঃ রূপা সেন

দীর্ঘ দু বছর ধরে, কোভিড-১৯ ভয়াবহ দিনগুলো পার করতে পেরে, আমরা নিজেদের প্রকৃতই ধন্য অনুভব করছি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে আমাদের সকলের জীবন ফিরবে, সেই প্রত্যাশাই রাখি।

বহু প্রতিকূলতার মধ্যে থাকলেও বিভাগের মেয়েরা আবারও 'রাষ্ট্র চেতনা' র জন্য লেখার ডালি সাজাতে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আবার আমরা সাধ্য মত উপহার দিতে চলেছি বিভাগের পত্রিকা 'রাষ্ট্র চেতনা'। লেখাগুলো যত্ন করে মেয়েরা লিখেছে তাদের মনের ভাবনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ লাভ করতে পেরে আমি বিভাগের প্রধানা হিসেবে আনন্দিত—

পত্রিকার কাজে নিয়জিত মেয়েদের বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং সর্বোপরি অধ্যক্ষা মহাশয়ার সহযোগিতাকে ধন্যবাদ জানাই—

সকলে ভাল থাকবেন—

নমস্কার

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মৌলিক অধিকার গুলোর অবস্থান ঃ

রূপা সেন

সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার গুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় নাগরিকদের সশক্তিকরণে প্রয়াশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিচার বিভাগ সেই সংবিধানের বিচার বিশ্লেষণ করে তথ্যের অধিকার থেকে শিক্ষার অধিকার বা বিনামূল্যে আইনগত সাহায্য লাভের উপায় করে দিয়েছে।

বহুবিধ মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনায় অর্ন্তভুক্ত করার চেষ্টা করছি।

(১) **সমতা ঃ** ভারতবর্ষে লিঙ্গগত প্রভেদ নতুন নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে, সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী আমাদের দেশেও সর্বত্র দেখা যায় নানান বৈষম্য। স্বাধীনতার পর বহুকাল Air India-র পরিষেবার নিয়মাবলী অনুযায়ী মহিলা flight attendant দের ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে অবসর নিতে হতো , অথবা বিবাহের পর সন্তান সম্ভবা হলেও চাকরী ছেড়ে দিতে হতো।

সেই কারণে ২০২০ সালে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে Short Service Commission মহিলা আধিকারিকেরা, সৈন্য বাহিনীতে Permanent Commissioned হতে পারবেন— এই সিদ্ধান্ত সত্যই উদ্‌যাপনের বিষয় হয়ে দাড়ায়। তাছাড়া আদালত কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের Promotion/পদন্বতিক্ষেত্রেও সমানাধিকারের উল্লেখ করে। লিঙ্গগত বৈষম্যের প্রতিরোধ করে।

সংবিধানে ১৪ নং ধারা সমতার যথাযথ মর্যাদা রাখার প্রয়াশি হয়েছে।

(২) **সৃষ্টিশীল / সৃজনশীলতার স্বাধীনতা ঃ** বম্বে চলচিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতার নগ্ন ছবি তোলার এবং জণমাধ্যমে তা প্রকাশ করার বিরুদ্ধে অনেকেই যেভাবে সোচ্চার হয়েছেন, তা দেখে আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে এত বছরেও আমরা শিল্পকলা জগৎকেও বাধানিষেধের বাইরে রাখতে অক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ সেখানেও মুক্তি নেই।

১৯৯৪ সালে ফুলনদেবীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে যে সিনেমা তৈরী হয়েছিল সেখানেও কয়েকটি দৃশ্যে যৌন হেনস্তা খোলাখোলি দেখানোর ফলে, সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকেই দৃশ্যভালাকে অত্যন্ত কুরুচিকর এবং অশোভন হিসেবে ব্যখ্যা করলে, চিত্র নির্মাতারা Art 19(1) (a) অধীন তাদের অধিকার দাবী করেন।

সেইসময় সুপ্রীম কোর্ট মেনে নিয়েছিল যে, Bandit Queen সিনেমাটি, একজন শক্তিশালী মানবের কাহিনী, সেখানে সামান্য কয়েকটা যৌন হিংস্রতার দৃশ্যর কারণে তা বাতিল হতে পারে না। চলচিত্রের মাধ্যমে যে বার্তা, জনগণকে ফিল্ম নির্মাতারা দিতে চাইছেন, যে ভাবে দিতে চাইছেন তাতে কোল বাধা থাকতে পারে না (right to freedom of Expression) এভাবে আদালত বাক্ স্বাধীনতার সীমানাকে কিছুটা হলেও প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

(৩) **ধর্মে অধিকার ঃ** কর্ণাটকের একটি মহাবিদ্যালয়ে কিছু ছাত্রীর হিজাব পরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল এই ঘটনা গত শতাব্দীর ৮০-র দশকে, ১৯৮৫ সালে কেরলের কিছু ছাত্র জাতীয় সংগীত গাইতে অস্বীকার করলে তাদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার, ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছাত্ররা Jehovah ধর্মের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার কেবল ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকতে চেয়েছে; বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে , আদালত বলে যে ছেলেরা অশ্রদ্ধায় জাতীয় সংগীত গায় নি, এমন নয় তারা কেবল তাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থামতে চেয়েছে । যেহেতু আমাদের সংবিধানে Art 25-28 ধর্মের অধিকার লিপিবদ্ধ করা রয়েছে সেখানে আমরা প্রত্যেকে ধর্মের অধিকার দাবী করতেই পারি।

(৪) **ব্যক্তিগত ক্ষেত্র এবং তার অধিকার ঃ** ২০১৭ সালে সুপ্রীমকোর্ট ব্যক্তিগত অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করে। Art 2 অনুযায়ী 'জীবনের অধিকারের' অর্ন্তভুক্ত Right to trivaly/ব্যক্তিগত স্তরের অধিকার।

আদালতের মতে এই অধিকার ব্যতীত রাষ্ট্রের নজরদারী ইত্যাদির বাইরে ব্যক্তির মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে। এর ফলে হয়ত ২০১৪ সাল হতে একই লিঙ্গের দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবেগণ্য করা হয় না।

আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো কলব্য করণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের দারস্ত হওয়ার সুযোগ স্বয়ং একটি মৌলিক অধিকার। B R Ambedkar এর মতে, Art 32 আমাদের সংবিধানের হৃদয় স্বরূপ। সুপ্রীম কোর্ট আদেশ ইত্যাদি জারী করে, অধিকার ভালো আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে। কোথাও অধিকার লঙ্ঘিত হলে, জনগণের জন্য মধ্যস্ততায় জরিমানা আদায় করে দেওয়া, সালিশি করে সমস্যা নিস্পত্তি করা এবং সর্বপরি পরিবেশের দূষণ রোধ করা— সমস্তটাই জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার প্রয়াশ।

পাবলিক কালচার (জনসংস্কৃতি)

-Rehana Khatun
Reg No.- 1202022400031
Class- 4th Sem (Honours)

ভূমিকা ঃ- 'Public Culture' অর্থাৎ সার্বজনিক সংস্কৃতি হল একটি 'পিয়ার পিয়ার রিভিউ করা, অন্তঃবিভগীয় একাডেমিক জার্নাল অফ কালচারাল স্টাডিজ।' যা বছরে তিনবার প্রকাশিত হয়- জানুয়ারি, মে এবং সেপ্টেম্বরে ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা। এটি 'নিউ ইর্য়ক ইউনিভার্সিটির' মিডিয়া কালচার এবং কমিউনিকেশন বিভাগ দ্বারা স্পনসর করা হয়। কিন্তু এটি কীভাবে সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের সমাজতাত্ত্বিক জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ তথা সুবিধাগত প্রশ্নগুলি পুঁজিবাদী যান্ত্রিকায়নের মাধ্যমে সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়লো সেটা বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে ইটালীর মার্কসবাদী আন্তনিও গ্রামশির আধিপত্যের ধারনার দুটি তত্ত্ব ও নিষ্ক্রিয়বিপ্লবের ধারনা থেকে। ধারনা দুটিতে বলা হয়েছে যে ঃ-

প্রথমঃ- এটি হল পুরো সমাজ চলা একটি প্রক্রিয়া, আর,

দ্বিতীয় ঃ- এটি প্রভুত্বশীল এবং অধীনস্ত শ্রেনীগুলির মধ্যে একটি সম্পর্ক। বিখ্যাত ব্যাখাবার্তা ক্রিস্টন বুচি গ্লুকোস্ম্যান গ্রমশির তত্ত্বের আর একটু এগিয়ে বলেছেন যে গ্রামশির আধিপত্যে সমাজের অভিব্যক্ত হয় সেই সব প্রতিষ্ঠান সমূহের, আদর্শতত্ত্ব সমূহের, ব্যহারীতা বা অনুশীলনসমূহের এবং নিযুক্ত বা সমূহের যৌগ হিসেবে যারা প্রভুত্বশালী মূল্যবোধ সমূহের সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

তাছাড়া ইতিহাসগত কারণে রাষ্ট্রশক্তির প্রবল্যের উপস্থিতি এবং একটি বুর্জোয়া শ্রেনীর অনুপস্থিতি শ্রমিক শ্রেনীর দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটি 'রণকৌশল' হিসেবে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের জমি তৈরি করে। গ্রাশির বিশ্লেষণ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারনাটি হল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অসফল, ফরাসী জ্যাঁকোবাদের তুলনায় বিপ্লবমুখী বুর্জোয়া শ্রেনীর প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক রণনীতি। সুতরাং, গ্রামশির বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব অনুযায়ী আধিপত্যের বাহক যদি প্রভুত্বশালী শ্রেনীটি হয় তবে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের সংগঠক, অনুঘটক, সংঘটক হল রাষ্ট্র। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক এবং 'Ceitical Theory'-র আদিগুরু জুর্পেন হাবেরমাস তাঁর The Structural Trnsformation of The public Shpere নামক বইতে দেখিয়েছেন একটি ঐতিহাসিক গঠনরূপ হিসাবে 'Public Culture' বা সর্বজনিক ক্ষেত্রটি কীভাবে গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া 2010 থেকে 2015 পর্যন্ত পাবলিক কালচারের প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আসেন নিউইর্য়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ইন্সস্টিটিউশন যার পাবলিক কলেজের ডিরেক্টর 'এরিক ক্লিনেনবার্গ। 2015 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত' কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক 'শামুস খান' পাবলিক কালচারের সম্পাদক ছিলেন। ২০২০ সাল থেকে জার্নাল সম্পাদন করেন অর্জুন আপাদুরাই এবং এরিফা রোবলস- এন্ডারসন।

1992 সালেপাবলিক কালচার শ্রেষ্ঠ জার্নালের পুরষ্কার পায়। এবং 2000 সালে শ্রেষ্ঠ বিশেষ ইস্যু দ্য কাউন্সিল লামিও জার্নালস থেকে। 2013 সালে। এই সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদক অর্জনের জন্য ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ডের সহ বিজয়ী পাবলিক কালচার নামে প্রাধান্য পায়।

পাবলিক কালচারে সিনেমার ভূমিকা ঃ-একটি 'Public Culture' সৃষ্টিতে সিনেমার উল্লেখ না করলেই চলে না। ভারতে সংস্কৃতিতে সিনেমার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের সিনেমাভারতে নির্মিত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। দেশের চলচ্চিত্র নির্মানের প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, কলকাতা, নয়াদিল্লি, অমৃতসর, কোচি, ব্যাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর। কটক এবং গুয়াহাটি। ভারতের সিনেমার মধ্যে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং ভাষার নির্মিত চলচ্চিত্র যার মধ্যে রয়েছে 'হিন্দি সিনেমা, তেলেগু সিনেমা, অসমীয়া সিনেমা, মৈথিলি সিনেমা, টলিউড সিনেমা, ব্রজভাষা সিনেমা, গুজরাটি সিনেমা, রাজস্থানি সিনেমা, হারিয়ানভি সিনেমা, পাঞ্জাবি সিনেমা, তেলেগু সিনেমা, কাশ্মিরী সিনেমা, রাজস্থানী সিনেমা, বাংলা সিনেমা ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় সিনেমা বিশ্ব চলচ্চিত্র গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রাচ্যজুড়ে অনুসরণ করা হয়েছিল।

ভারতীয় প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ও ভারতীয় চলচ্চিত্রেরজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারের পরিণত হয়েছে।

তাছাড়া বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বার্ষিক চলচ্চিত্র আউটসুটের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বক্স অফিসের পরিপ্রেক্ষিতে এটি 2019 সালে তৃতীয় স্থানে ছিল যার মোট আয় US $ 2.7 প্রায় বিলিয়ান। 2020 সালের হিসাবে, অন্যান্য সমস্ত ভাষার চলচ্চিত্র হিন্দি ভাষার চেয়ে বেশি জলপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবং 2021 সালে , তেলেগু সিনেমা বক্স অফিসের দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম চলচ্চিত্র শিল্পে পরিণত হয়। এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ 'বাহুবলী দ্য বিগিনিং'-এর মতো চলচ্চিত্র গুলিবহু ভাষার ডাব করা হয়েছে। এইভাবে 'প্যান ইন্ডিয়ান' আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতীয় 'চলচ্চিত্র' দেখে যা আয়ের 12%

অন্যদিকে আবার এই সিনেমা আমাদের কাছে আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন যখন ভারতবর্ষে 'Youtube' -এর ব্যবহার করা শুরু হয়। 'Youtube' হল একটি আমেরিকান অনলাইন ভিডিও শেয়ারিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটর্ফম। এর সদর দপ্তর হল 'সান ব্রুনো, ক্যালির্ফোনিয়ায়। এটি 14 ই ফেব্রুয়ারী 2005 সালে 'স্টিভ চেন, চ্যাড হার্লি এবং জাভেদ প্রমুখরা প্রথম চালু করেন। 'Google' এর পর এটি হল দ্বিতীয় সর্বধিক পরিদর্শন ওয়েব সাইট প্রত্যেক মাসে 'Youtube'-এর এক বিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারিতা আছে আর সম্মিলিতভাবে প্রত্যেকদিন এক বিলিয়ানেরও বেশি মানুষ 'Youtube' দেখেন। 2019 এর 'মে' মাসের আগে পর্যন্ত ভিডিওগুলি প্রতি মিনিটে 500 ঘন্টায় ও বেশি সামগ্রীর হারে করা হচ্ছিল। অক্টোবর 2006 এ প্রথম ভিডিও পোষ্ট করার 18 মাস পরে এবং অফিসিয়াল লঞ্চের 10 মাস পরে Youtube কে Google 1.65 ডলারে কিনে নেয়। 2020 সালের জন্য 'Youtube'-এর রিপোর্ট করা আয় ছিল $ 19.8 বিলিয়ান। Google এর দ্বারা কেনার Youtube পর ওয়েবসাইটের বাইরে 'মোবাইল অ্যাপস' নেটওর্য়াক টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম এর সাথে লিঙ্ক করার ক্ষমতা পায়। Youtube সাধারণ যে ভিডিও গুলি কোট করা হয় সেগুলি হল- খবর, মিউসিক ভিডিও, ভিডিও ক্লিপ, শর্ট ফিল্মি, ফিচার ফিল্ম, ডকুমেন্টরি, ব্লগ এবং আরো অনেক কিছু। আছাড়া Youtube একটি অভূতপূর্ব সামাজিক প্রভাব রয়েছে, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, ইন্টারনেট প্রবনতাকে প্রভাবিত করে এবং বহু কোটিপতি সেলিব্রিটি তৈরি করে।

এছাড়া সিনেমা আমাদের ব্যাক্তিগত জীবনে ও বিশেষ প্রভাব ফেলে। সিনেমা দেখা যেমন আমরা ভীষণ মজা পাই মনরঞ্জিত হই তেমনি আমাদের নিত্য কর্মজীবনের বিভিন্ন রকম চর্চা থেকে যুক্ত হতে ও আমাদের সাহায্য করে। তেমনি সিনেমা আমাদের কাছে একটি soft power এ পরিণত হয়। কারণ যখন আমরা কোনো সমস্যায় থাকি, আমাদের মন খারাপ থাকে তখন নিজেকে মনোরঞ্জন করার জন্য Motivate করার জন্য আমরা সিনেমা দেখি, গান শুনি। সিনেমা সাধারণ মানুষের জীবনেও বিশেষ প্রভাব ফেলে। সিনেমায় তারকাদের আমরা এতটাই পচ্ছন্দ করি তার সাথে সাথে তাদেরকে এতটাই প্রভাবিত করিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকে তারকাদের মতো fashion করে, তাদের মতো style করে তাদের মত হওয়ার চেষ্টা করি। অনেকে আবার এতটাই প্রভাবিত হয় যে নিজেকে তারকা হিসেবে গণ্য করতে লাগে।

সমস্ত কিছু আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম প্রথম সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান সংগঠক ধারনা না হলেও রাজনীতিকে ও যৎপরোনাস্তি প্রভাবিত করে। আমরা দেখার চেষ্টা করলাম যে কীভাবে মানুষ সংস্কৃতি, জীবনের ধারণাও জীবনে প্রতিটি বর্হিঃমুখী দিকটিকে পুঁজিবাদের এবং গণতন্ত্রের কল্যাণে সমাজের মানুষের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ইত্যাদি এছাড়া ও আরো অনেক বিশেষ বিশেষ কারণ লক্ষ্য করা যায়। যেগুলি ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগৎকে আরোবেশি জনপ্রিয় করেছিল।

———

পুঁজিবাদ ও গণসংস্কৃতি

-Pallabi Baidya
Roll No.- AH20155
Class- B.A (2nd Year)

_____ আমাদের মতে পুঁজিবাদ গণসংস্কৃতির উপর প্রাথমিক যে অভিঘাতটি সৃষ্টি করেছে তা হল পন্যমুখিতা বা Consumerism. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অধীনে সংস্কৃতির একটা মন্ত্র ছিল 'Plain living and high thinking' কিন্তু পুঁজিবাদী গণ উৎপাদনের জায়গায় যেটা নিয়ে আসে তাকে বলা যায় 'high living and Plain thinking' দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন সাধিত্র যতই সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসে ততই আধিবিদ্যক চিন্তার জায়গা নেয় পার্থিব সুখাকাঙ্খা। এই প্রক্রিয়াকে আরো যেটা সাহায্য করে তা হল শুমপিটারের ভাষায় 'The Civilization of capitalism' শুমপিটার তাঁর বাইরের 'The Civilization of capitalism' প্রবন্ধে ঠিকই দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া আচরনকে এবং ধ্যানধারণা সমূহকে যুক্তি নিষ্ঠ করে এবং সেটা করার সময় আমাদের মনের ভেতর থেকে আধিবিদ্যক ধারণাসমূহের সঙ্গে সমস্ত ধরণের মরমী, রহস্যকৃত এবং রোমান্টিক ধারণা তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এটা কেবলমাত্র উদ্দেশ্যসমূহকে সিদ্ধ করার ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতিগুলিকে পুনগঠিতই করে না, আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে প্রভাবিত করে। বস্তুতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদ, আজকীয়তা, এবং শ্বশদ্র সমাধি কবরের এইমানুষের দিকের পৃথিবী এখান থেকেই আসে কোনো যৌক্তিক প্রয়োজন থেকে না এলেও খুবই স্বাভাবিকভাবে। একদিকে আমাদের উত্তরাধিকার সূতে পাওয়া কর্তব্যের চেতনা তার সাবেকি ভিত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষদের আরো ভালো করার উপযোগিতা ভিত্তিক ধারণার মধ্যে গ্রথিত হয়। আর সেটা ঈশ্বরের ভয়ের থেকে অনেক বেশি যুক্তিবাদী সমালোচনা সহ্য করতে সহ্য করতে পারে। আরেকদিকে আত্মার একই যৌক্তিকতায়নের প্রক্রিয়া শ্রেনীভিত্তিক অধিকারের থেকে সমস্ত রকমের অতি অভিজ্ঞতাবাদী অনুমোদনের চটক সরিয়ে দেয়। বোধ হয় এই কারণেই প্রসিদ্ধ জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার প্রতীচ্য সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ করেছেন 'Process of disenchantment ' কে, তাঁর 'science as vocation' প্রবন্ধে। ওয়েবার সেখানে বলেছেন যে, সভ্য মানুষধ্যান ধারনা, জ্ঞান এবং সমস্যাসমূহের দ্বারা সংস্কৃতির এক অব্যাহত সমৃদ্ধকরনের মাঝখানে স্থিত হয়ে জীবনে সম্পর্কে ক্লান্ত হতে পারে কিন্তু তৃপ্ত নয়। ফলে তিনি প্রশ্ন করছেন, যা কিছু প্রায়োগিক তার বাইরে প্রগতির কোনো সনাক্তকরণযোগ্য অর্থ আছে কি? পণ্যমুখিতাকে আমরা তাই দেখি পুঁজিবাদী গণ উৎপাদনের কারণ এবং কার্য উভয় হিসেবেই।

এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছেন রাজনৈতিক দলগুলিও এবং তাদের চাপে আধুনিক রাষ্ট্রও। রাজনৈতিক দলগুলিও পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে ক্রমাগত ইউারোপীয় শ্রমিকশ্রেনীর বস্তুগত অবস্থার উন্নতির জন্য যতই চেষ্টা করেছে, এবং তার চাপে রাষ্ট্র যতই নাগরিকদের রাজনৈতিক নাগরিকতত্ত্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক নাগরিকত্ব প্রসারিত করেছে, ততই সে প্রতিফলিত করেছে নতুন পুঁজিবাদীদের একটি ইচ্ছাকে। সেটা হল শ্রমিকদের যদি উৎপাদনের স্তরে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। Michacl Mann তাঁর Consciousness and Action among the western working class বইতে দেখিয়েছেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পুঁজিপতিদের এই সর্তকতা শিল্প সংঘাতকে অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহে নামিয়ে আনা ছাড়াও কোনো শিল্প উদ্যোগের নিয়ন্ত্রনের বৃহত্তর প্রশ্নগুলিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে এবং শ্রমিকদের বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতিকে সম্পূরিত করার পথ করিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং একদিকে পুঁজিবাদের গণউৎপাদনমুখিতা, আরেকদিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শ্রমিকশ্রেনীর প্রতি যে অর্থনৈতিক নাগরিকত্বকে প্রসারিত করেছে তা শ্রমিকশ্রেনীর বুর্জোয়াকরণ ঘটানো ছাড়াও এক ভোগ্য পণ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক একরূপতায় সামিল করেছে ধনিক ও দরিদ্র উভয়কেই। এর থেকেই সৃষ্টি হয় ভোক্তা সংস্কৃতি।

ভোক্তা সংস্কৃতি শব্দটি ভোক্তা সমাজের সংস্কৃতিকে বোঝায় এটি প্রস্তাব করে যে সমসাময়িক সমাজের উপস্থাপনা এবং মূল্যগুলি ভোগের চারপাশে আবর্তিত হয়ঃ
জীবনধারা নিমার্ণের জন্য পণ্য ক্রয় এবং উপভোগ। বিশেষ পণ্য এবং ব্রান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়া ভাল জীবনের চিত্র এবং উপস্থাপনা সরবরাহ করার জন্য বিজ্ঞাপন এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তা সংস্কৃতি একটি আধুনিকতাবাদী গতিশীল দ্বারা চালিত হয় যাতে নতুনত্ব, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বহিরাগত জিনিসের উপর জোর দেওয়া পণ্য ও অর্থের পরিসর প্রসারিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের অনেক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন সাইটে যেমন মল, সিটি সেন্টার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, থিম পার্ক, পর্যটন রিসর্ট, হেরিটেজ সেন্টার যা বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশন, দর্শনীয় স্থান এবং সাইন প্লে এই 'স্বপ্নের পৃথিবী' নতুন অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি এবং ইচ্ছার অন্বেষণের সাথে দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্যায়নের দিকে নিয়ে যায়।

ফ্যাশন ঃ ফ্যাশন শ্রেষ্ঠত্বের সমান একটি সামাজিক ঘটনা। এই ঘটনা মানব জাতির মতো পুরানো হতে পারে, তবে ভোক্তা সমাজের উত্থানের সাথে সাধানণ হয়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ফ্যাশনের একটি সহজ সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল 'সর্বশেষের সাথে প্রথম হওয়া'। সংজ্ঞাটি বোঝায়যে ফ্যাশন নেতারা, যারা অন্যদের ফ্যাশনে কি আছে তা নির্ধারিন করতে স্টাটাস হিসাবে দেখেন। কিনউ এটাও প্রয়োজন যে কিছু লোক ফ্যাশনের বাইরে, সবাই বা সবকিছু 'ফ্যাশন' হতে পারে না। আসলে একবারখুব সাধারণ কিছু হলে তা প্রতিস্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যদি না হয় ফ্যাশন পার্থক্য করতে করতে ব্যবহার করা যাবে না সুতরাং ফ্যাশন একটি পুনরাবৃত্ত ঘটনা যা তার নিজস্ব ইতিহাস তৈরী করে।

এইসব কিছু নিয়েই তৈরী হয়েছে 'Public Culture'।

জাতীয়তাবাদ

Nationalism

-Rajoshree Mondal
Roll No.- AH20-105
Class- 4th Sem

জাতীয়তাবাদ হল একটি অতি বিতর্কিত রাজনৈতিক আদর্শ। এই রাজনৈতিক আদর্শ ধংস এবং সৃষ্টি উভয় এর প্রতি সমস্যা সৃষ্টি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ সবসময়ই সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে। আবার সুস্থ জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আবেদন পরাধীন জাতীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হল একটি প্রবল মানষিক অবস্থা, অনুভূতি অর্থনৈতিক এবং একটি তাত্ত্বিক ধারণা।

জাতীয়তাবাদের অর্থ ও প্রকৃতি ঃ- জাতীয়তাবাদের দুটি মুল বৈশিষ্ট্য বর্তমান ঃ- ১) নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ এবং দুনিয়ার অন্যান্য জনসমাজ থেকে সতন্ত্রবোধ। জাতীয়তাবাদের ধারনাটির স্তর পরিবর্তীত হল গান্ধীজী প্রমূখের সময় জাতীয়তাবাদের ধারণা আর বর্তমানে রাহুল গান্ধীর জাতীয়তাবাদের ধারনা এক নয়।

এই ধারনার উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ায়; প্রধানত পুঁজিবাদের হাত ধরে।

মূলত পশ্চিমী দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছে বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে

অর্থাৎ মুনাফা শিকারের জন্য সাম্রাজ্যবাদ অবলম্বন করেছে (Exclusive nationalism).

তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঃ- উত্তর ঔপনিবেশিক বর্তমান রূপটি বিকাশের পিছনে যে সব কারণ রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বোধ করি উপনিবেষ বিরোধী জাতিয়তাবাধের উন্মেষ। জাতীয়তাবাদ হল তৃতীয় বিশ্বে একটি আধুনিক বিষয়। যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপনিবেশিক সুত্রে পশ্চিম থেকে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উপনিবেশ শাসনকালে এই আধুনিক পশ্চিমি জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আন্দোলন/ বিপ্লব, তত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতন এবং প্রভাবিত হয়। জাতীয় আত্ম সচেতনতা তৃতীয় বিশ্বে ঐতিহাসিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে। স্বাধীনতা লাভ করার পর, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় রাষ্ট্রগুলির যেসব বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা দেখতে পাই। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রে বিকাশের পশ্চিমী লক্ষ গুলির বদলে, কিছু বিকল্প লক্ষের কথা বললেও যেমনটা ভারতে গান্ধীবাদীজাতীয়তাবাদ চেয়েছিলেন। যেহেতু জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের জন্মলগ্ন থেকেই তার মধ্যে নিজজাতির বিকাশের স্বপ্নের বীজ বপন করা আছে সেহেতু পশ্চিমী বিকাশের লক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানালেও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের শেষপর্যন্ত সেই মডেলকে বাতিল করেনি।

আমাদের দেশেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নেহেরু , সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বহুতাত্ত্বিক নেতাই আধুনিক বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ তার সংগ্রামী চরিত্রের জন্য এমন কিছু জন মোহিনী নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের জন্ম দিয়েছে। যারা নিজস্ব রাষ্ট্র রাজনীতির আঙিনা অতিক্রম করে বিশ্বরাজনীতির দরবারে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হল জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা। বিশেষ করে, বহু ধর্ম ভাষাভষী অঞ্চলভিত্তিক দেশগুলিতে যেমন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একধরনের জোড়া তালি দেওয়া ঐক্য তৈরী হলেও , স্বাধীনতার পর নানা অন্তবিরোধ ও খন্ড জাতিয়তাবাদ মাথা চাড়া দিতে থাকে।

ফলত, শেষ পর্যন্ত, পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুবর্তী হলেও, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ হল এক ব্যাতিক্রমী জাতীয়তাবাদ কারণ তার ভিন্নতা। এই ভিন্নতা এমন নয় যে তা জাতীয়তাবাদের পশ্চীমী রূপের সম্পূর্ণ বিরোধী। পশ্চিমী অনুবর্তিতার মধ্যে ভিন্নতা আবার 'ভিন্নতার মধ্যে পশ্চিমী অনুবর্তিতা এই সংকর রুপটিই তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য এখানেই তার অনন্যতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনা ঃ

-Gargi Koley
Roll No.- AH20-75
Class-

জাতীয় চেতনা হল জাতীয়তাবাদের উৎস। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে ভারতে কোনও জাতীয়তাবাদী ধারনা ছিল না। বিদেশি শাসনের ফলশ্রুতি হিসেবেই আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। পরাধীন দেশে স্বেচ্ছাচারী পরাজিত বিদ্বেষ ও দেশের গৌরবের উপর ভিত্তি করেই দেশপ্রেম জেগে ওঠে। স্বজাত্যবোধ উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী বিদেশী শোষক ইংরেজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তাঁদের বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ। তবে এই শোষিত ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালানোটা ছিল অলীক স্বপ্ন। আর এই অলীক স্বপ্নকে বাস্তব রূপ যিনি দিয়েছিলেন, যার দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রেমের ধারনায় ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন— তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন ভারতবর্ষের প্রথম গ্র্যাজুয়েট সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষের আত্মজাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তাই তিনি তাঁর লেখনী প্রতিভাকে করেন দেশের মানুষের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার জন্য। বঙ্কিম বলেন—''বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখবে? তুমি লিখবে, আমি লিখব, সকলেই লিখবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক পরিবর্তন ঃ—

১৮৬৪ সালে কিছু পূর্বে জাতীয়তা ধারনার অঙ্কুরোদগম্ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল তার বেশ কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর এই যুগান্তকারি রূপান্তর ছাত্রজীবনের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, তার প্রভাব বঙ্কিম মানসে পড়েছিল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়, তার প্রভাব রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের ''পদ্মিনী উপাখ্যানের স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?" গোপনে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার সচেতন করেছিল। ১৮৬১ সালে পাত্রী লং-এর কারাদন্ড এবং মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবের দমনে স্বয়ং বঙ্কিমের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকে বিচলিত ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সিদ্ধান্তে উদ্দিপীত করে তুলেছিল। সম্ভবত, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ''মেঘনাদ বধ" বাংলা ভাষার অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।১৮৬০ সালে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখা যায় ইংরাজীতে ''Raj mohan's Wife" উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত থাকতে। ১৮৬১সালে কিশোরচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ''ইন্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সালের পূর্বেই বঙ্কিম মানসে এক আকস্মিক রূপান্তরিত সাধিত অবজ্ঞাত অশিক্ষিতের বাহন বাংলা শিক্ষিতের বাহন, ইংরেজী, আসন অধিকার করে বসে। যে বাংলা ভাষা চর্চা সম্পর্কে, তার কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সন্দিগ্ধ। যে বাংলার চর্চা তার কাছে ছিল অপমানকর এই রূপান্তরের দাবী নিয়ে বঙ্কিম-মানসে আর্বিভূত হয়।

তিনিমনে করেন, ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা কম থাকা, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা না থাকা, কিংবা ভারতীয়দের সংস্কৃত সম্পর্কে নীরব থাকাই পরাধীনতার অন্যতম কারণ। অবশ্য এজন্য তিনি ভারতীয় জলবায়ুর প্রভাবের কথা বলেছেন। ভারতের উর্বরভূমি, সহজে জীবন যাপন করার মাধ্যম, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা স্পৃহা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল বলে তার মত। কিন্তু এটা সামগ্রিক অনাকাঙ্খার একটি অংশ মাত্র, কারণ স্বাধীনতা চেতনা ভরতীয়দের মধ্যে চিরকালই দুর্বল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ব অনুভব করে তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা ভীষণ জরুরী বলে তিনি মনে করতেন। তবে তিনি এও জানতেন যে,''হিন্দুরা সাধারণত স্বাধীনতা লাভ অভিলাষী বা যত্নবান নহে।" বঙ্কিমচন্দ্রের সময় মধ্যবিত্ত শ্রেনী প্রধানত পেশাদারি গোষ্ঠীর রূপ নিয়েছিল। তিনি বুঝিয়েছিলেন ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইংরেজের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে করতে হয়, ইংরেজদের নিয়ন্ত্রনেণর বিরুদ্ধে করতে হয়। পেশাদারি মধ্যবিত্তের অবস্থান ইংরেজদের আশে পাশে। জাতি প্রতিষ্ঠার তাগিদ সেখানে টান মারে উল্টো দিকে। 'আনন্দমঠ' সরকারের অসন্তোষের

কারণ হয়েছিল বলে গ্রন্থটি প্রকাশনার সময় যেখানে ''ইংরোজ এবং মুসলমানদের'' আক্রমণ করার জন্য দেশীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান ছিল, গ্রন্থটি প্রকাশনার সময় বাদ দিতে হয়েছিল 'ইংরাজ' কথাটি। আনন্দমঠ-এর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল,''ইংরাজরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্দার করিয়াছে।'' বলাবাহুল্য এই প্রকাশ্য রাজভক্তি তাঁর মনের কথা নয় রাজরোষের আশঙ্কার প্রভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিস্তর ফারাক, তাই ভারতীয় জত্যভিমান গড়ে তুলতে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। এই জাত্যভিমান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বদেশপ্রেম বা দেশভক্তি। ঋষি অরবিন্দ মনে করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'দেশভক্তির ধর্ম' গড়ে তুলতে অন্যবদ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইভাবে বিপিনচন্দ্র পালকে অনুসরণ করে বলা যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নতুন দেশভক্তির জনক'। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মাতৃরূপে বিচার করেছিলেন। অধ্যাপক নিখিল সুর গান্ধিকে অনুসরণ করে উল্লেখ করেছেন,'' আনন্দমঠ জাতীয়তার .....বর্ণ পরিচয়। বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান যেমন সমস্ত গ্রন্থ পাঠে সাহায্য করে, তেমনি আনন্দমঠ দেশকে দিয়ে ছিল জাতি প্রতিষ্ঠার ভাবনা ও প্রেরণা।'' বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ''বন্দেমাতরম'' সঙ্গীত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আবার একদিকে দেশকে মায়ের আসনে (দেবী দূর্গা) অন্যদিকে, শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব তৎসহ মহাভারত ও গীতার পুনরুত্থান এবং অনুশীলন ধর্মের প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবেই হিন্দু ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তাই বঙ্কিম বিরোধী গবেষকগণ এইদিকে স্বাদেশীকতাবাদী বলেছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের চিন্তা বিকাশে একদিকে যেমন দেশ মাতৃকার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তেমনই ধর্মানুশীলন তত্ত্বে প্রীতির দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন। যার অন্যতম প্রকাশ ঘটে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে । উপন্যাসের উপকরমণিকায় তিনি লিখেছেন, ''অরন্যানির নিস্তবদ্ধতা যথিত করিয়া মনষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল,''আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না''।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ভক্তিকে স্বদেশের ভক্তি বলেছেন। 'আনন্দমঠ'-এ ভবানন্দ মহেন্দ্রকে জানাচ্ছেন, আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমি জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্য- শ্যামলা—মা'' আমরা তাকেই বন্দনা করি। এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বলেন ব্যাক্তি বা জাতির ব্যাক্তিত্বনির্মানে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সম মা-ই আনয়ন করে। আর জাতি গঠনের মূল চালিকা শক্তি হল প্রীতি। কারণ নৈতিকতা ও আত্ববিকাশের পথ তৈরী করে প্রীতির বন্ধন। প্রীতি অনেকটা কান্টের ''শর্তহীন আবশ্যকের মতো''। আবার সেখানে সম্প্রদায়বাদীদের মূল ধারনাও নিহিত। কারণ প্রীতি হল এমন এক স্বার্থশূন্য ভালোবাসা যা মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীর প্রতিও সর্বোপরি জাতির প্রতি একাত্মকা, নৈতিক ও আত্মবিকাশ তথা আত্মবিশ্বাস জাগরিত করে।

বিশ্বায়ন
(Globalization)

-Mandira Dasmunshi
Roll No.- AH20-160
Class- 4th Sem

বিশ্বায়ন (Globalization) শব্দটি একুশ শতকের শুরুতে আর্ন্তজাতিক ও বিশ্ব মানবিক আদর্শ রূপে সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আরো নিবিড় করার পন্থা হচ্ছে বিশ্বায়ন।

সমাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন 'বিশ্বায়ন' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ বিভিন্নভাবে বিশ্বায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

জ্যাকসন ও সোরেনসনের মতে, আর্ন্তজার্তিক স্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে বিস্তৃত নিবিড় করে তোলার নাম হল বিশ্বায়ন।

দীপক নায়ারের মতে,- বিশ্বায়ন একটি প্রক্রিয়া এবং যা অধিকতরভাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, এর উন্মুক্ততা এবং অর্থনীতি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সঙ্গে জড়িত। বিশ্বায়ন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে বিভিন্ন অর্থনীতির সংহতির কথা বলে।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ঃ

১। বিশ্বায়ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতাকে গড়ে তুলতে বিশ্বায়ন সাহায্য করে।

২। বিশ্বায়ন বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধন গড়ে তোলে। যা দরিদ্র দেশগুলির বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৩। বিশ্বায়ন কেবল আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পথকেও প্রশস্থ করে।

৪। বিশ্বায়নের ফলে ভৌগোলিক সীমানাসমূহের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

বিশ্বায়নের প্রভাব ঃ

বিশ্বায়নের ফলে অনুন্নত দেশগুলিতে যেসব প্রভাব পড়েছে, সেগুলি হল-

১। জাতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস ১৯৯০ সালে বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় আয়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুদ্রার মূল্য অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে।

২। **বিদেশী শিল্পপতিদের আগমন**- বিশ্বের উন্নত দেশগুলির বড়ো বড়ো শিল্প সংস্থাগুলি অনুন্নত দেশগুলির বাজার দখল করে নিচ্ছে। ফলে দেশীয় শিল্প ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

৩। **বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রে বিদেশি মালিকানার প্রভাব বৃদ্ধি ঃ**

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যাঙ্ক, শিল্প মালিকানায় বিদেশি প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। **শ্রমব্যবস্থার ক্ষেত্রে**- বিশ্বায়নের অন্যতম ফল হচ্ছে শিল্পের বেসরকারিকরণ, বেসরকারিকরণের ফলে শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিকিকরণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে, যার অন্তিম ফল হল শ্রমিক ছাঁটাই।

বিশ্বায়নের সুফল ঃ

ভারত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন থেকে দেশীয় বাজারের মুক্তি ও আমদানি- রপ্তানি ও বিদেশী বিনিয়োগের বেড়াজাল উন্মুক্ত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্বে মনে করা হয়েছিল যে, ভারতের চিরাচরিত আর্থিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারনা অমূলক প্রমানিত হয়েছে, ভারতীয়রা বিশ্বায়নের সুফলকে অনুভব করতে পেরেছে।

১। উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আরমদানি ব্যয়ের অধিকাংশই মেটানো হচ্ছে রপ্তানি আয়ের সাহায্যে। অর্থাৎ মুক্ত অর্থব্যবস্থা বিনিময় হারকে সরলীকরণ করেছে। এর ফল স্বরূপ রপ্তানি বানিজ্যের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে ভারতের বেহাল অর্থনীতির কারণে দেশের সোনা বিদেশে বন্ধক দিতে হয়েছিল, সেই বন্ধকের হাত থেকে ভারত আজ মুক্ত। ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার

রাজনৈতিক সংস্কৃতি
(Political Culture)

-PujaYadav
Roll No.-
Class-

ল্লজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন অ্যালমন্ড। তিনি এবং ভাবা তাঁদের 'The Civic Culture' শীর্ষক গ্রন্থে রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও পাওয়েল, ফাইনার, লুসিয়ান পাই, বিয়ার, ইউলাম প্রমুখ লেখকগণ রাজনীতিক সংস্কৃত্রি ধারণাকে জনপ্রিয় করেছেন।

দেশশাসনের কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্ব জনসাধারণের মতামতের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এজন্য বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব -মানসিকতা পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কাজেই, রাজনীতিক পরিবেশ -পরিমন্ডলের প্রতি জনসাধারণের ভাবনাচিন্তা মানসিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার পর্যালোচনাই হল একটি দেশের রাজনীতিক সংস্কৃতির আলোচনা। মানুষজন রাজনীতি সম্পর্কে কী ভাবে সেই বিষয়ে এবং তাদের বিবিধ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আবেগ,অনুভূতি সম্পর্কিত বিষয়-ই হল রাজনীতিক সংস্কৃতি।

ব্যক্তিমানুষ জন্ম লাভ করেই রাজনীতিক সংস্কৃতির অধিকারী হয় না, রাজনীতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় রাজনীতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি জন্ম লাভ করে এবং যে রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে বড়ো হয় , এবং এক বিশেস রাজনীতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির মদ্যে বড়ো হয়। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত রাজনীতিক দল, অন্যান্য রাজনীতিক সংস্থা, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও তার কার্যবলী প্রভৃতির সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ স্থাপিত হয়। এইভাবে ব্যক্তির মদ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি
(Political Culture In India)

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে মূলত তিনটি প্রধান শ্রেনিতে ভাগ করা হয়- ১) সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ২) আংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ৩) নিস্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে তীব্র ঔদাসীন্য বা সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নাগরিকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় থাকে এবং নিজের নিজের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে সজাগ থাকে। এখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা গভীর হয়। নিস্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণ পুরো মাত্রায় সজাগ থাকে, তবে তারা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করে না।

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই তিন শ্রেনির কোনো একটির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। ভারতে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, শ্রেনি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি রয়েছে। আকার-প্রকারের দিক থেকেও ভারতবর্ষ বিরাট। এখানে এক এক অঞ্চলের মানুষের এক এক রকম মানসিকতা, আচার- ব্যবহার, অভ্যাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধ। স্বাভাবিকভাবেই এখানে এক প্রকার মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

আবার অন্যদিকে জাতপাত, ধর্মীয় মৌলবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষাভিত্তিক রাজনীতি প্রভৃতি সার্বোক বা ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গুলি এখানে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামোতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে গ্রহন করেছে। বড় বড় শিল্প, কলকারখানা গড়ে উঠেছে, রাস্তাঘাট, রেলপথ, ব্যভসা- বানিজ্য ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আবার একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে। জাতপাতের প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক আনুগত্য , বিচ্ছিন্নতাবাদ, রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ, ভাষাগত মতান্ধতা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাগুলি এখানে যথেষ্ট সক্রিয়। সাম্প্রদায়িক ও উপজাতীয়তাবাদী আনুগত্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।

খালিস্তান, ঝাড়খন্ড, গোর্খাল্যান্ড প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে উপ-সংস্কৃতির একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। মনিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরামে উপজাতিভুক্তদের একাংশের আন্দোলন সংকীর্ণ উপজাতীয় আনুগত্যের চরম প্রকাশ। ভারতের

তহবিলের পরিমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। ভারতবর্ষে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত চাল, আলু, গম, তুলা প্রভৃতি শস্যগুলির আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে দাম বেশি থাকায় তা রপ্তানি করা হচ্ছে। ফলে, কৃষকরা অতিরিক্ত দাম পাচ্ছে।

৪। ভারতীয় টাকাকে পুরাপুরি লেনদেন বা বিনিময়যোগ্য করা হয়েছে। ফলে ডলারের অনুপাতে টাকার বিনিময় হারে ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ভারতীয় টাকার হারে স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫। বিশ্বায়নের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানির পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি আমদানি ব্যয়ের প্রায় সমস্তটাই রপ্তানিকৃত অর্থের সাহায্যে মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বায়নের কুফল ঃ

বিশ্বায়নের সুফল ভোগের পাশাপাশি আজ তার কুফলগুলিও ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিদারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সেগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

১) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের বহুজাতিক বৃহৎ কোম্পানিগুলি এদেশে অবাধে কাজ করার ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, যার ফলস্বরূপ ভারতীয় অর্থনীতির মূল স্তম্ভ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য বা FDI(Forcign Direct Investment)-এর জন্য বিদেশি বিনিয়োগপতিদের কাছে খুলে দেওয়া হল ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলিকে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রাখত তারা আজ মৃতপ্রায়। বহুসংখ্যক শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হয়েছে।

৩) কৃষিপন্যের আর্ন্তজাতিক বাজার অবাধ হওয়ার ফলেখাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। বিদেশী সস্তা চাল এদেশে আসছে। ফলে কৃষকরা চাষ করে লাভজনক দাম পাচ্ছে না। ফলে কৃষিতে তার প্রভাব পড়ছে।

৪) বিশ্বায়নের পরিনামে ভারতে বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদেশি বহুজাতিক সমস্যাসমূহের মূলধন উৎপাদন পদ্ধতির কারণে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাকরির সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে।

৫) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদনের উর্ধ্বমুখী ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি।

৬) প্রভিডেন্ট ফান্ড ৬ পেনশন প্রভৃতি রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাগুলি আজ বাজার নির্ভর হয়ে গেছে। সরকার এখন পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা শেয়ার বাজারে লগ্নি করছে। ফলে, নাগরিকদের ভবিষ্যৎ জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে।

৭) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের দৌলতে আজ বিদেশি টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং বলিউড সিনেমার প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংকটের মুখে পড়েছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দৌলতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার ঃ

তবে বলা যায় যে, বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়, উচিত ও নয়; সংযুক্তিকরণ আবশ্যক। তবে,ভারতের স্বার্থের অনুকূলে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। মূলধনের বিশ্ব বাজারের সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির সংযোগের ফলে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, তার সঙ্গে সম্যকভাবে সংগতিসাধনের সামর্থ্য ভারতীয় অর্থনীতিকে অর্জন করতে হবে। বিশ্বায়নের অশুভ ফল দূর করতে হলে ভারতকে তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কারের কাজে মন দিতে হবে এবং বিদেশীদের ওপর নির্ভর না করে স্বর্নিভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সার্বিক চিত্রে ভারতের বেকারত্ব, কারখানায়, লক্-আউট, শ্রমিকের কাজ হারানো, মাথাপিছু আয় কম, দরিদ্র্য বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে। তাই, সমালোচকরা বলে থাকেন, ভারতে 'Globalization' নয় 'আমেরিকানাইজেশন' ঘটেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে ভারত রাষ্ট্রের শ্রেনীচরিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়, ভারত হল বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত ও সামন্তপ্রভুদের শ্রেনীশাসন মূলক একটি সংস্থা। এখানকার বুর্জোয়া শ্রেনি একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা করে, অন্যদিকে জমিদারদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়।

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'রাজনীতির ব্যক্তি কেন্দ্রীকরণ' কোনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারতের রাজনীতির অ—্যতম নির্ধারক হল সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। প্রথমদিকে কংগ্রেস দল নেহেরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব বাড়লে তাঁর নামেই কংগ্রেস দলের নতুন নামকরণ করা হয় কংগ্রেস(ই)। নেহেরু এবং তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর এই সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের প্রতি জনসাধারণের প্রগাঢ় আস্থা থাকার সুবাদে রাজীব গান্ধির পক্ষে ভারতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে অসুবিধা হয়নি। বর্তমানে রাজীব পত্নী সোনিয়া গান্ধি যে কংগ্রেস সভানেত্রী হয়েছেন, তা সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের পথ ধরেই।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রবণতা। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রয়াস শুরু হয় এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়। শুধু রাজ্যগুলিতে নয়, কেন্দ্রেও এই সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে।১৯৯৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে দেব গৌড়ার নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, সেটি ১৩টি দলের মিলিত সরকার। অতঃপর ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর যথাক্রমে গুজরাল, বাজপেয়ী এবং মনোমোহনের নেতৃত্বে কেন্দ্রে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভাষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন ভারতীয় রাজনীতির তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, অকলি দল, শিবসেনা প্রভৃতি যেসব দল রয়েছে , তার প্রত্যেকটি কোন না কোন ধর্মকে কেনদ্র করে গড়ে উঠেছে। আবার বিজেপি-র মতো দল ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত না হলেও, ধর্মকে হাতিয়ার করে ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ -এর মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যথেষ্ট সফল হয়েছে। ২০১০সালের পর থেকে পুঁজিবাদ নির্ভর অর্থনীতি আগ্রাসী জাতিয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে।

রবীন্দ্র ভাবনায় জাতীয়তাবাদ

-Monalisha
Roll No.- AH20-143
Class- 4th Sem

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি। ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে মানুষের মুক্তি, সমতা, স্বাধীনতা— এমন অনেক ধারনা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এজন্য ইউরেপীয় সভ্যতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। সেই ইউরোপীয় রেণেসাঁ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জাতীয়তাবাদ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনায় সমগ্র ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছেন এবং আজও করছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ধারণার মত আর্ন্তজাতিকতাবাদীর ধারনাটি তুলে ধরেন। তবে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশয় দেননি। কারণ, এর ভয়াবহতা তিনি জানতেন।

হিটলার মুসোলিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণতি কী, রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যস্থ করেছেন। আমরাও সেটা কমবেশি জানি। রবীন্দ্রনাথ এক জাতি সত্তার সঙ্গে আরেক জাতি সত্তার অস্তিত্বের বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছেন, এটি সহজ যোগসূত্র স্থাপন এর চেষ্টা করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন সর্বব্যাপী দৃষ্টি দিয়ে। তিনি এককনেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। সমাজে নানা রকম বিভক্তি বিদ্যমান থাকায় নেশন নির্মান সম্ভব নয়— এটাই ছিল তার অনাস্থার মূল কারণ। ন্যাশনালি জমের নাম দিয়েছেন তিনি 'জিওগ্রাফিক্যাল ডেমন।' প্রথম দিকে তার ধারনা ছিল 'নেশন একটি মানস পদার্থ'। কিন্তু পরে নেশনকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে দেখেছেন, যা জণগণকে 'যান্ত্রিক প্রয়োজন' সংঘবদ্ধ করে। তার ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষে ন্যাশানালিজমে খাটবে না। কারণ, ইউরোপে শাসক-শোষিতের যে ভেদ ঘটেছিল। সেটা জাতিগত বিভেদ নয়; শ্রেনীগত ভেদ। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ ধর্ম ও জাতির নামে। তার মতে , দুর্বল ভিত্তির উপর দাড়িয়ে জাতি গঠনের চেষ্টা এসব ভেদগুলিকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

আমলাতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে বিপ্লোবত্তর রাশিয়ার 'মৌলতার নতুন নির্মানের' প্রস্তুতি করলেও মানব চরিত্রের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার রীতি ও তিনি মানতে চাননি। তিনি সেই রাষ্ট্রকে মানেননি। যে রাষ্ট্র স্বৈরাচার। স্বৈরাচারী সমাজের বিরুদ্ধো ও তার ধিক্কার ছিল স্পষ্টতর। ব্রিটিশ যুগে রাষ্ট্র ছিল স্বৈরাচার। রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছিলেন সমাজকে আলাদা করে নেবেন রাষ্ট্রের সর্বভুক ও বুভুশুগ্রাস থেকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজই প্রধান রাষ্ট্র নয়। একথা তিনি বার বার বলেছেন। খুব জোর দিয়েই।

স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তি অমর নয়; তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ কখোনো হারণ নি। সেজন্যই তার তাসের দেশের তাসেরা মানুষ হয়ে ওঠে, অচলায়তন ভেঙে পড়ে মুক্তধারা বইতে থাকে এবং রক্তকরবীর সেই ভীষণ রাজারও পতন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' —এ ইংরেজ রাজত্বের অবসানের অবশ্যম্ভাবিতার যে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। তার সেই একই বিশ্বাস সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও । তাই তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেন নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা বিশেষ কোন সংস্কৃতি কে প্রাধান্য দেননি। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদে কোনো বিশেষ মতাদর্শকে ও শ্রেষ্ঠত্ব দেননি। তার জাতীয়তাবাদ উঠে এসেছে মানবিক চেতনা থেকে, আত্মোপলব্ধি থেকে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার যখন বৃহত্তর বঙ্গকে দুই ভাগ করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে একটি প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে তখন তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সমাবেশ করেন।

ত্রিশের দশকে তিনি ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক বর্ণবিভেদ এবং বর্ণে বর্ণে ধরা ছোঁয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত মতামত প্রচার শুরু করেন। তিনি এই বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, কবিতা রচনা, বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে নাটক রচনা এবং কেরালার একটি মন্দিরে এই প্রথা ত্যাগের আহবান জানানোর মাধ্যমে তার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

জীবনের শেষ দশকের পুরোটা রবন্দ্রনাথ জনসমক্ষে ছিলেন। তার জনপ্রিয়তা এই সময়ে ছিল তুঙ্গে। ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ভরতের বিহার রাজ্যে সংঘটিত প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন, এটি দলিতদের বশীভূত করার জন্য ঈশ্বরের একটি প্রতিশোধ। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের জন্য গান্ধিকে জনসমক্ষে তিরষ্কার করেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব উদবিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে ক্ষুধা ও দরিদ্র্যের মত সাধারণ সমস্যার ভারে ভারতকে জর্জরিত হতে দেখে এবং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘর্ষ, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর বাড়াবাড়ি রকমের ইন্ধন ও উষ্কানি দিতে দেখেও তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র ৬ বছর পর ১৯৪৭ সালে আগস্টে ভারত বিভক্ত হলো। সেই সময় হিন্দু মুসলিম ভয়াবহ দাঙ্গা হল। তাতে রাজনীতিবাদের উস্কানি ও ইন্ধন ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস ট্র্যাজেডি দেখেননি। দেখতে তিনি কী করতেন জানি না।